PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

লর্ড ওয়েলেসলির প্রিয় শহর বারাকপুর

অভিজিৎ বাগ

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলী, পিন- ৭১২৪০১, পশ্চিমবঙ্গ;
ইমেল: *bagabhijit17@gmail.com*

সারসংক্ষেপ

লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতবর্ষে এসে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে কলকাতার খুব কাছের শহর বারাকপুর সম্পর্কে তিনি অবহিত হন। এরপরে তিনি কলকাতার গভর্নর হাউসের মত বারাকপুরেও একটি গভর্নর হাউস ইত্যাদি নির্মাণ করতে প্রয়াসী হন এবং শেষে নির্মাণকাজ প্রায় সম্পন্ন করেন। তিনি ইংল্যান্ডের সঙ্গে এই শহরের সাদৃশ্য খুঁজে পান এবং নিজের মনের মত করে এই শহরটি গড়তে থাকেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁর পরবর্তী গভর্নর জেনারেলরাও এই গঙ্গাতীরের শহরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং শহরের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এখানে অফিস বাড়ি নির্মাণ, পার্ক, স্কুল, চিড়িয়াখানা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ ইত্যাদি সবই কলকাতার বিকল্প হিসেবে এই শহরকে গড়ে তোলার এক আন্তরিক প্রয়াস ছিল। আজও এই ঐতিহ্যের শহর দু'শো বছরের নিদর্শন বহন করে চলেছে।

সূচকশব্দঃ লর্ড ওয়েলেসলি, বারাকপুর, চিড়িয়াখানা, ঐতিহ্য।

এই গবেষণাপত্রটি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হল, একটি ছোট শহরের উপাখ্যান রচনা শুধু নয় বরং কলকাতার কাছেই একটি শহরের গুরুত্ব কিভাবে বিদেশি একটি জাতি অনুভব করেছিলেন সেটি আলোকপাত করা। ইতিহাস রচনায় ছোট শহর বা তথাকথিত কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে মানুষের আগ্রহ কম হওয়ার কারণ সেই বিষয়ে ঐতিহাসিকের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তথ্যর অভাব। বর্তমানে ইতিহাসচর্চায় আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার উদ্যম দেখা দিয়েছে। ভারত এই বিষয়ে অনেক পরে পথচলা শুরু করে। ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রামাণিক আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার এই প্রয়াস আজ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে হলেও শুরু হয়েছে এটাই আশার কথা। হয়ত কোন সুদূর অতীতে ঘটে যাওয়া এই ছোট ও আঞ্চলিক ঘটনাগুলি ভবিষ্যতে ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। উক্ত গবেষণাপত্রটি মূলত বর্ণনামূলক এবং অংশত বিশ্লেষণমূলক। এতে কিভাবে বারাকপুর শহরের গড়ে ওঠার সঙ্গে গভর্নর জেনারেলদের স্বতঃপ্রণোদিত উদ্যোগ ছিল সেটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়াও কেন এই শহরকে তাঁরা ভালবেসেছিলেন সেটাও দেখানো হয়েছে। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো ভারতের উপকূলবর্তী শহরগুলিতে তাঁদের বানিজ্যকেন্দ্র গড়ে তোলেন। কলকাতা ছিল অন্যতম উল্লেখযোগ্য বানিজ্যকেন্দ্র। অবসর বিনোদনের জন্য কলকাতার সন্নিকটে বারাকপুরের অবস্থান ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে খুব পছন্দের গন্তব্য ছিল।

এইভাবে গভর্নর জেনারেলদের কাছে এই বারাকপুর শহর এতই প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে তাঁরা এটিকে কলকাতার বিকল্প হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতবর্ষের তিন প্রান্তে তিনটি প্রেসিডেন্সি গড়ে উঠেছিল যথা; কলকাতা, বম্বে এবং মাদ্রাস প্রেসিডেন্সী। উক্ত তিনটি প্রেসিডেন্সীর মধ্যে কলকাতা প্রেসিডেন্সী ছিল সর্বাধিক স্পর্শকাতর ও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ ছিল; তৎকালীন বাংলা তথা কলকাতাকে কেন্দ্র করে কোম্পানি সমগ্র দেশে এক দৃঢ় শাসনকাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁদের অভিপ্রায় ছিল কলকাতাকে রাজধানী করে সমগ্র দেশ শাসন করা। সেই জন্যই সমগ্র কলকাতা শহর জুড়ে বড় বড় প্রাসাদ, সুউচ্চ অট্টালিকা, অফিস বাড়ি ইত্যাদি সেই ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকেই নির্মাণ শুরু হয়েছিল। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই শুধু ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নয় অন্যান্য ইউরোপীয় বনিক গোষ্ঠীও একই সাথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিলেন। প্রথম দিকে ইংল্যান্ড সমেত ইউরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক অনুমোদিত কোম্পানিগুলি এদেশে বাণিজ্য বিস্তার করে মুনাফা লাভের আশায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে থাকেন। এই বানিজ্যকেন্দ্র গুলি হল; কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সুরাট, চন্দননগর প্রভৃতি। এই সব বিদেশী কোম্পানিগুলির মধ্যে খুব অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁরা ছিলেন বিপুল অর্থ ও সম্পদের অধিকারী। শুধু তাই নয় ইংল্যান্ডের সামরিকশক্তি বিশেষ করে নৌশক্তি ছিল তৎকালীন বিশ্বে অদ্বিতীয়। এই ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারকর্তৃকথেকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পেতেন অন্যদিকে ভারতে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলি তাদের দেশের সরকার কর্তৃক তেমন উৎসাহ ও সাহায্য পেতেন না। ফলে ইংল্যান্ড ভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির এদেশে তাদের উপনিবেশে স্থাপন করার স্বপ্ন সফল হয়নি। ইউরোপও ভারতে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল ফ্রান্স। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দুই চরম প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে সামরিক লড়াই অনিবার্য ছিল। এদেশে ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ শাসন করার আশা ত্যাগ করে।

কলকাতার কাছেই সবুজ গাছগাছালি ও অরণ্য দ্বারা আবৃত এক জনপদ বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাকপুর। গভর্নর জেনারেলদের কাছে এই ছাউনি শহরের নিঝুম ও নিস্তরঙ্গ জীবন বেশ উপভোগ্য ছিল। বিশেষ করে বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলির কথা বলতেই হয়। আম, জাম লিচু, কাঁঠাল ও আরও নানা বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ এক অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবসময় এখানে বিরাজ করত। উচ্চপদস্থ ইংরেজকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ ইংরেজ কর্মচারী সকলেরকাছেই সারা সপ্তাহের কলকাতা শহরের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশও ব্যস্ততা ছেড়ে নিরালয়ে ছুটি উপভোগ করার এক আদর্শতম স্থান ছিল এই শহর। স্রোতস্বিনী গঙ্গার খুব কাছে এই বারাকপুর শহরটি অবস্থিত। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এই সেনানিবাস এলাকার পরিবেশ ছিল খুবই আরামপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর। বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) এই শহরকে এতই পছন্দ করতেন যে, তিনি বারাকপুরকে

'ইংল্যান্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ' করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।[১] তাই তিনি রাজধানী কলকাতা থেকে সমস্ত সরকারি দপ্তর, অফিস ইত্যাদি বারাকপুরে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। যাইহোক এর বেশ কয়েক বছর পূর্বে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে গভর্নর জেনারেল স্যার জন ম্যাকফারসনের সময়কালে (১৭৮৫-১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ২২০ বিঘা বা ৬৬ একর জমি এবং সঙ্গে দুটি খড়ের বাংলো ক্যাপ্টেন জন ম্যাক ইন্টারের কাছ থেকে মাত্র পঁচিশ হাজার টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল কমান্ডার-ইন-চিফের (সি. আই. সি.) বসবাসের জন্য। এই স্থানটি ছিল গঙ্গা নদীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত। এটাই ছিল বারাকপুর সেনানিবাস এলাকায় অবস্থিত বিখ্যাত সেই উদ্যান বা পার্কের সূচনাপর্ব।[২] এরপর বাংলারগভর্নর জেনারেল স্যার জন শোরের আমলে (১৭৯৩-১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দ) আরো নয় বিঘা জমি কেনা হয়েছিল। সি. আই. সি.-র বাসস্থান এলাকাটির বিস্তৃতির জন্য ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত জমিটি ক্রয় করা হয়েছিল।[৩]

বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়ে লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি ইংল্যান্ডের এক অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন। ফলে ব্যয়বহুল ও বিলাসবহুল জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলায় এসেও তার এই রুচির অন্যথা হয়নি। তৎকালীন কলকাতায় বসবাসের জন্য তিনি এক গভর্নমেন্ট হাউস (১৭৯৯-১৮০৩ খ্রিঃ) নির্মাণ করেছিলেন। যেহেতু কলকাতা ছিল রাজধানী শহর তাই এখানে প্রাসাদ নির্মাণ করতে তাঁকে তেমন সমস্যার সন্মুখিন হতে হয়নি। কিন্তু গ্রীষ্মকালে কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়া ছিল তাঁর কাছে যথেষ্ট কষ্টকর। অন্যদিকে বারাকপুরের সি. আই. সি.–র বাংলো লর্ড ওয়েলেসলির খুবই পছন্দ হয়েছিল। তাছাড়াও এই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে তিনি ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে তৎকালীন সি. আই. সি. স্যার এ. ক্লার্ককে তাঁর বারাকপুরের আবাসস্থানটি পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেন। এরপরে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের পয়লা ফেব্রুয়ারী ক্লার্ক উক্ত স্থানটি ত্যাগ করেছিলেন।[৪] ওয়েলেসলি সি. আই. সি.–র জন্য পাঁচশো টাকা ভাতার ব্যবস্থা করে অন্য একটি জায়গা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করেন এবং এরপরেঅতি উৎসাহে তিনি বাংলোসহ স্থানটি অধিকার করেন। তারপর ওয়েলেসলি তাঁর পছন্দমত বাংলোটি সংস্কার করে প্রাসাদ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। এর সঙ্গেই তাঁর অধিকৃত বিঘা বিঘা জমির ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে এই স্থানটিকে সুদৃশ্য করে তোলেন। এই নির্মাণ কাজে তিনি চার্লস ওয়াটকে অধীক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। লর্ড ভেলেন্টিয়া এবং হেনরি সল্টকে এই সংস্কারকাজে শিল্পী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে এই সংস্কার ও নির্মাণের পরেও ওয়েলেসলির তা পছন্দ না হওয়ায় উক্ত নির্মাণটি ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে ইংল্যান্ডের 'বোর্ড অব ডিরেক্টর' ওয়েলেসলির এই ব্যয়সাপেক্ষ নির্মাণকাজ সমর্থন করেনি। কলকাতায় গভর্নমেন্ট হাউস থাকা সত্ত্বেও বারাকপুরে আর একটি কান্ট্রি হাউস বা রাজভবন নির্মাণের জন্য বিলেতের কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতিঅসন্তোষ প্রকাশ করে তাঁকে গভর্নর জেনারেলের পদ থেকে ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে অপসারিত করেন। কারণ এই দুটি রাজভবন (একটি কলকাতা ও অন্যটি বারাকপুরে) নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করেননি। তবে তিনি ভারত ত্যাগের পূর্বেই বারাকপুর সেনানিবাস সংলগ্ন স্থানে আরও বেশ কিছু সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলেন।

যখন ভারতে গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ থেকে বাঁচার জন্য এখানকার পাহাড়ি অঞ্চলগুলির পরিচয় বা অস্তিত্ব ব্রিটিশদের কাছে অজানা ছিলতখন ওয়েলেসলির বারাকপুরে রাজভবন তৈরির পরিকল্পনা ছিল বাস্তবসম্মত।[৫] এছাড়াও তিনি বারাকপুর সেনানিবাস এলাকায় প্রায় ৩৫০ একর জমি অধিগ্রহন করেছিলেন এবং তাঁর উদ্যোগেই এখানকার জঙ্গল ও জলাভূমি সংস্কার করে একটি সুন্দর পার্ক তৈরি করা হয়।[৬] এখানেই বিশিষ্টজনের থাকার জন্য বেশ কয়েকটি সরকারি বাংলো নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলে সমগ্র অঞ্চলটি সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠতে থাকে। এই পার্ক ও সংলগ্ন বাগানের কিছুটা অংশ নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সেকালের পশুশালা বা চিড়িয়াখানা। এই চিড়িয়াখানা ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়েছিল।[৭] ওয়েলেসলির সময়ে এই চিড়িয়াখানাতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে নানা জীবজন্তু আনা হয়েছিল।[৮] তিনি ভারত মহাসাগরের অ্যালডাব্রা দ্বীপ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বেশ কিছু কচ্ছপ এনে এই চিড়িয়াখানায় তাদের বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করেছিলেন। বিখ্যাত চিকিৎসক ও ভ্রমণকারী স্যার ফ্রান্সিস বুকানন হামিল্টনকে (১৭৯৪-১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ, বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিস) এই চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি ওয়েলেসলির স্নেহ ধন্য ছিলেন। এই কচ্ছপগুলির একটি প্রায় কয়েক শতক বেঁচেছিল। কচ্ছপটিকে পশ্চিমবঙ্গসরকার ২০০২ সালে সন্মান জানানোর জন্য নাম দেয় 'অদ্বৈত'।[৯] ১৮৭৫ সালে নাগাদ কলকাতায় আলিপুর চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠিত হলে এইকচ্ছপটিকে বারাকপুর পার্ক থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

এখানে একটা বিষয় বিশেষ উল্লেখ্য যে, লর্ডওয়েলেসলি প্রথমে ফোর্টউইলিয়াম কলেজের জন্য পশুপাখি সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু' বোর্ড অব ডিরেক্টর' কর্তৃক আশাহত হওয়ায় তিনি বারাকপুরে প্রথম চিড়িয়াখানা তৈরি করেছিলেন। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে ২৫শে আগস্ট 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকায় এই চিড়িয়াখানার নানা জীবজন্তুর নানাবিবরণ ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। যেমন, দেশীয় নীলসা হরিণ, শ্বেতবর্ণহরিণ, ইংল্যান্ডের বলদ, কৃষ্ণবর্ণবাঘ ইত্যাদি পশুর সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি উক্তসুত্র থেকে।[১০] শ্রীমতি ফ্যানি পার্কস ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটেন থেকে ভারত ভ্রমনে এসেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে আমরা বারাকপুরের লাটসাহেবের বাড়ি ছাড়াও সেখানকার নৈসর্গিক প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে অবগত হতে পারি।[১১] উপরিউক্ত বিবরণ থেকে বারাকপুর সেনানিবাসের প্রকৃত পরিচয় আমরা পাই। এছাড়াও এখানে আর একটি মজার ও আনন্দ উপভোগ করার জায়গা ছিল ঘোড়দৌড়। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে বারাকপুরে এই ঘোড়দৌড় শুরু হয়েছিল।[১২] কিছুদিনের মধ্যেই এই খেলার জনপ্রিয়তা বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে বিশেষত ছুটির দিনগুলিতে এই খেলায় অংশ নিতে কলকাতা থেকে ইউরোপীয় সাহেবদের সমাগম হত এই ঘোড়দৌড়ের মাঠে। অর্থাৎ অবসর বিনোদনের সর্বাধিক পরিচিত স্থান ছিল বারাকপুর সেনানিবাসের লতা, বৃক্ষ ও গুল্মরাজিতে সুসজ্জিত পরিদৃশ্যমান এই লাটবাগান। নেটিভরা বা এদেশীয় মানুষরা ছিলেন এই খেলার দর্শকমাত্র। তাঁদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। তবে এইস্থানে নেটিভদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পশুশালার নানা প্রজাতির প্রাণীদের স্বচক্ষে দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করা।এমনকি ইউরোপ থেকেও অনেকে এই চিড়িয়াখানার পশু-পাখি দেখতে আসতেন। এই সব বন্য প্রাণীর ছবি অঙ্কন করে তাঁরা তাঁদের অনেকেই নিয়ে যেতেন। এদের পরিচর্চার জন্য একজন দক্ষ পশুচিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়েছিল।

যাইহোক ওয়েলেসলি তাঁর স্বাদের বারাকপুর ত্যাগ করলেও এই শহরের উন্নয়নের গতি কখনোই থেমে থাকেনি। তাঁর আমলে নির্মিত 'কান্ট্রি হাউস'টি ভেঙ্গে ফেলা হলেও এই বাড়িটির প্রায় সাতশ গজ উত্তরপূর্বে যে আরও একটি নবনির্মিত ভবন ছিল সেটিকেই ধীরে ধীরে লাটভবন বা রাজভবন হিসাবে গড়ে তোলা হতে থাকে। এরপর গভর্নর জেনারেল স্যার জর্জ বারলোর আমলে (১৮০৫-০৭ খ্রিস্টাব্দ) এই ভবনের দক্ষিণের বারান্দার কোণগুলিকে নিয়ে তা কয়েকটা ঘরে পরিণত করা হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে আজকের লাটবাগান গড়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীকালে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের (১৮১৩-২৩ খ্রিস্টাব্দ) আমলে এই ভবনটির একদিকে গাড়ি বারান্দা তৈরি করা হয়। এরপর লর্ড আর্মহাস্টের আমলেও (১৮২৩-২৮ খ্রিস্টাব্দ) এই ভবনের কিছু পরিবর্তন সাধন করা হয়। লর্ড অকল্যান্ডের (১৮৩৬-৪২ খ্রিস্টাব্দের) আমলে ভবনটির পশ্চিমদিকে ব্যালকোনির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপর লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০ খ্রিঃ) এবং লর্ড রিপনের (১৮৮০-৮৪ খ্রিঃ) আমলে যথাক্রমে নতুন করে সিঁড়ি তৈরি এবং সিঁড়ির কাছে কাঠের খিলান তৈরি করা হয়েছিল। শেষে লর্ড দ্বিতীয় মিন্টো (১৯০৫-১১ খ্রিঃ) ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করলে সমস্ত বাড়িটি আলোর ধারায় আলোকিত হয়ে ওঠে। এইভাবেগড়ে উঠেছিল আজকের লাটভবন। বর্তমানে এই লাটভবনসহ সমগ্র অঞ্চলটি 'লাটবাগান' নামে পরিচিত। ভ্রমণপিপাসুদের কাছে বারাকপুর শহরের লাটবাগান একঅতিসুগম্য স্থান।

১৮১৭ থেকে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বারাকপুর সেনানিবাস সংলগ্নস্থানে লর্ড হেস্টিঙ্গের সময়কালে নতুন করে একটি পাখিরালয় বা পক্ষীশালা তৈরি করা হয়।[১৩] এখানে নানা শ্রেণী ও প্রজাতির পাখি আনা হয়েছিল। এছাড়া ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরো একবার নতুন করে একটি বন্য জীবজন্তুর আবাসস্থল তৈরি করা হয়েছিল।[১৪] বারাকপুর সেনানিবাসে যখন লর্ডআর্মহাস্ট (বাংলার গভর্নর জেনারেল ১৮১৩-২৩ খ্রিঃ) বসবাস করতেন সেই সময়ে এই রাজভবন পার্ক, চিড়িয়াখানা ও ঘোড়দৌড়ের জন্য জনপ্রিয় এলাকাটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এখানে একটি বিষয় প্রমাণিত যে, একাধিক গভর্নর জেনারেল কর্তৃক অনুকম্পা লাভের ফলেই এই লাটবাগান একটি বিশিষ্ট স্থান হিসেবে পরিগনিত হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। লেডি আর্মহাস্ট রাজভবন সংলগ্নস্থানে বাজি পোড়ানোর উৎসব আয়োজন করে সকলের চিত্তবিনোদন করতেন।তাঁরা দুইজনেই এই বারাকপুর শহরকে পছন্দ করতেন। তাই এই ছাউনি শহরকে কিভাবে আরো প্রানবন্ত করে তোলা যায় সেবিষয়ে তাঁরা বিশেষ করে লেডিআর্মহাস্ট যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বারাকপুর থেকে দ্রুত কলকাতা যাতায়াতের জন্য প্রথমে জলপথ থাকলেও পরে স্থলপথেও যোগাযোগ রক্ষার জন্য নতুন করে রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল তবে বর্তমানে এই রোডটি বি. টি. রোড (Barrackpore Trunk Road) নামে পরিচিত।[১৫] এই রাস্তার দুধারে আম, বট ইত্যাদি নানা বৃক্ষরাজি ও গুল্ম পথিকের দৃশ্যপটে ও হৃদয়ে একস্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি করত।

তবে একটা প্রশ্ন আমাদের মনে থেকেই যায় তাহল কেন গভর্নর জেনারেল ও তাদের লেডিরা এই ছাউনি শহরকে সুপরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করে গেছেন ? মাত্র কয়েক বছরের জন্য গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব এবং তারপর এই গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যহতি নিয়ে ইংল্যান্ডে নিজের দেশে

ফিরে যেতেন। তাই এই স্বল্প সময়কালের মধ্যে প্রায় সব গভর্নর জেনারেলই কেন তাঁদের কার্যকালের শুরু থেকেই এই বারাকপুর শহর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতেন ? তাছাড়া বাংলায় দমদম, বালিগঞ্জ ও বহরমপুর ইত্যাদি জায়গাতেও তো সেনাছাউনি বা ঐ জাতীয় সামরিক কাজে ব্যবহিত স্থান ছিল তাহলে বারাকপুর তাঁদের কাছে কেন এত প্রিয় শহর ছিল ? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে এই বারাকপুর শহরের যে একটা নিজস্বতা ও বহুমাত্রিক রূপ ছিল তার ভিতর। নিজস্বতা বলতে বলা যায়, এই শহরের প্রতিটি কোণে সর্বদা এক অনন্য প্রাকৃতিক রূপ ও বৈচিত্র বিরাজমান ছিল। স্থানটি প্রায় জনমানববর্জিত হওয়ায় এর পরতে পরতে নানা রঙের সমাহার ঘটত। নানা গোত্রের বৃক্ষরাজি, লতা, গুল্ম এবং নাম না জানা পাখির কূজন, বন্য জীবজন্তুর আনাগোনা ইত্যাদি এর পরিবেশকে এক অনন্য মাত্রাদান করেছিল। তাছাড়া অগুন্তি গাছাগাছালি থাকার ফলে এর আলোছায়া পরিবেশে দিনের বেলাতেও এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করত। সঙ্গে ছিল গঙ্গার সলিলস্নিগ্ধতা। এই নদীর কোলঘেঁষে অবস্থানের জন্য রাজভবন তথা এর সংলগ্ন অঞ্চলের পরিবেশ সকলকে মুগ্ধ করত। রাতের বেলায় চন্দ্রমার উজ্জ্বল আলোকবিন্দু যখন নদীর বিপুল জলরাশির উপর দিয়ে বয়ে যেত তখন এক অপরূপ স্নিগ্ধ শোভা দেখা যেত।

তবে বর্তমানে এখানে চিত্তবিনোদনের আর তেমন কোন উপায় নেই বললেই চলে। তবে গঙ্গার স্নিগ্ধতাও মনমুগ্ধকারী প্রাকৃতিক পরিবেশ এখনও যেকোন আগন্তুকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সেই পার্ক, চিড়িয়াখানা এখন বিস্মৃতির অন্তরালে। এখানকার হাওয়ায় এখনও অতীতের আভাস পাওয়া যায়। পুরানো বাড়ি, শতাধিক প্রাচীন বৃক্ষ, সেনানিবাস প্রভৃতি ইতিহাসের সাক্ষী বহন করছে। শুধু সেনানিবাসটিই এখনও আছে। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে এখানে যে ফ্লাগস্টাফ হাউস গড়ে তোলা হয়েছিল বর্তমানে এটিই এখন রাজভবনের মর্যাদা পায়। কলকাতা থেকে রাজ্যপালের বারাকপুরে আগমন ঘটলে তিনি এই ভবনেই বাস করেন। পুরানো রাজভবন এখন হাসপাতাল। এই হাসপাতালের বর্তমান নাম বিগ্রেড হাসপাতাল। কোম্পানি আমলের চিড়িয়াখানার স্মৃতি বহন করছে এখানে 'চিড়িয়ামোড়' নামে একটি স্থান যেটি মূল সেনানিবাস এলাকার বাইরে অবস্থিত। শেষে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির কথা উল্লেখ করতেই হয়; কারণ তিনি বারাকপুর শহরকে 'দ্বিতীয় কলকাতা' শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা সফল হয়নি। তাসত্ত্বেও একথা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, আজকের বারাকপুর শহরের বিশেষকরে লাটবাগান অঞ্চলের মনোরম ও সুদৃশ্য প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তরালে রয়েছে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও আগ্রহ।

এই গবেষণাপত্রটি পাঠ করলে বর্তমান বারাকপুর শহরের উন্নয়নের পিছনে মূল কাণ্ডারী যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিলেন তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা হবে পাঠকের। আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে পাঠকের কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখতে হবে এই শহরেই ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। বিদ্রোহে যোগদানের শাস্তিস্বরূপ সিপাহিদের কামানের সামনে দাড় করিয়ে গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভৌগলিক অবস্থান ও সামরিক গুরুত্বের কারণে তাই এই শহরের প্রতি কোম্পানি বাহাদুরের যে সচেতন দৃষ্টি ছিল একথা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্রঃ

১। রায়,কানাইপদ, ঐতিহ্যের আলোকে চানক বারাকপুর, প্রভাপ্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৪, পৃ.২৪

২। Pal, Sahib, A. C., *History of Barrackpore Park,* Private Secretary's Press, West Bengal, 1931, pp. 01

৩। *Ibid*, pp. 02

৪। Nilsson, Sten, *European Architecture in India 1750-1850*, Faber & Faber limited, London, the University Press Glasgow, 1968, pp. 123

৫। Blechynden, Kathleen, Calcutta Past & Present (edited by N.R. Ray), Abinas Press, Calcutta, 1978, pp. 194

৬। রায়, কানাইপদ (সম্পা), বারাকপুরের সেকাল একাল, নগর পেরিয়ে, বারাকপুর, ২০০১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১১

৭। রায়, কানাইপদ, ঐতিহ্যের আলোকে চানক বারাকপুর, ঐ, পৃ. ২৯

৮। রায়, কানাইপদ,(সম্পা),বারাকপুরের সেকাল একাল, ঐ, পৃ. ২১১

৯। রায়, কানাইপদ, ঐতিহ্যের আলোকে চানক বারাকপুর, ঐ, পৃ. ৩২

১০। রায়, কানাইপদ, ঐতিহ্যের আলোকে চানক বারাকপুর, ঐ, পৃ. ২৯-৩০

১১। ঐ, পৃ. ৩১

১২। ঐ, পৃ. ৩৩

১৩। Curzon, George Nathaniel (The Marquis of Kedleston, K.G., Viceroy & Governor General: 1899-1904 & 1904-1905), British Government in India: The Story of the Viceroys and Government Houses, Cassess and Company Ltd., London, 1925, Vol.-II, pp. 23

১৪। *Ibid*

১৫। রায়, কানাইপদ, ঐতিহ্যের আলোকে চানক বারাকপুর, ঐ, পৃ. ২৪